

## পার্থিবজগতের অপার্থিবতা বিশ্লেষণ\*

অনন্ত বিজয় দাশ

পূর্ববর্তী প্রকাশের পর ...

(২) **অতীন্দ্রিয় অনুভূতি** : পার্থিবজগতের দ্বিতীয় অপার্থিব আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (Extra-Sensory Perception সংক্ষেপে E.S.P)। আমাদের চারপাশের সাধু-সন্ত-অবতার-অধ্যাত্মবাদী-মহাপুরুষসহ বুজরুক-ভণ্ডের দল ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত অনুভূতির কথা বলে সুদূর অতীত থেকে বর্তমানে বেওসা করে আসছেন, অবাস্তব অলৌকিকত্বের স্বপক্ষে প্রচারণা চালিয়ে আসছেন। তাঁদের এ প্রচারণা অনেকসময় আমাদের মতো 'আধ-মরা'দের কাছে সত্য বলে মনে হয়; ধরাধামের ভিতরে-বাইরে অতিলৌকিকতার অস্তিত্ব রয়েছে বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি আর নবকলেবরধারী প্রচারকদের জগৎগুরু ভেবে মনপ্রাণ ঢেলে পূজা করি। পরামনোবিদ্যায় প্রচলিত আছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসমূহ হচ্ছে—(i) দূরচিন্তা (Telepathy) (ii) ভবিষ্যদৃষ্টি (Precognition) (iii) অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি (Clairvoyance) এবং (iv) জড়পদার্থে মানসিক শক্তি (Psychokinesis বা Pk)।<sup>(৯)</sup> পাঠক, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে দেখে নিই এগুলো আসলে ঠিক কী। আমরা সবাই কম-বেশি দূরচিন্তার নাম শুনেছি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজি Telepathy শব্দটিই ব্যবহার করে থাকি। সাধারণভাবে এটি হচ্ছে দূর থেকে অন্য একজনের মনের কথা বা চিন্তাকে জানতে পারার ক্ষমতা। ভবিষ্যদৃষ্টি হচ্ছে ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা বলে দেয়ার ক্ষমতা, মানে আগামীকাল-পরশু অথবা আরো পরে কোনো নির্দিষ্ট দিন কী ঘটতে পারে—তা আগেভাগে বলতে পারার ক্ষমতাকেই ভবিষ্যদৃষ্টি বোঝায়। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি হচ্ছে দূরের কোনো জিনিষ দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা। যেমন:—আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি ঠিক এই মুহূর্তে কি করছেন, তা বলতে পারার ক্ষমতাকেই বোঝায়। আর মনোগতিশক্তি বা জড়পদার্থে মানসিক শক্তি—কোন জড়বস্তুকে নিজের ইচ্ছেমত গতিশীল করা, অবস্থার পরিবর্তন করা অথবা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে বোঝায়।

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কয়েকটি কথা বলে নিই। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান সবসময়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই কোন কিছু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে, বুঝে থাকে, গ্রহণ বা বর্জন করে থাকে। প্রযুক্তির প্রবল জোয়ারে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদণ্ডগুলি সর্বজনীন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দেখা যায়, ধর্মবাদিরা, অতিলৌকিকতার রক্ষককে রা নিজেদের ভণ্ডামোকে এখন বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রচার করতে চান, বিজ্ঞানের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাকে অলৌকিকতা দিয়ে পূর্ণ করতে চান। কারণ কেন যেন জনগণ বাসি অলৌকিকতাকে আগের মত খায় না। অলৌকিকতার সাথে বিজ্ঞানের কিছুটা মিশ্রণ থাকলে আম-পাবলিক চেটেপুটে খায়। তাই ধরাধামের বিধাতারা আজকে ধর্মের (অপার্থিবতার) সাথে বিজ্ঞানের খিচুরি পাকিয়ে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে চলছেন অনবরত। আগেকার নির্ভেজাল 'যন্তর-মন্তর'-এর কার্যকারিতা ফুরিয়ে গেছে। যা হোক, ইদানীং এ অতীন্দ্রিয় অনুভূতি নামধারী কুসংস্কারকে বিজ্ঞানের মোড়কে হাজির করা হচ্ছে, নাম দেয়া হয়েছে পরামনোবিদ্যা।<sup>(১০)</sup> বিজ্ঞানের নাম ভাঙিয়ে অপবিজ্ঞানের চর্চার উদাহরণ তো আর এ বিশ্বে কম নয়। এ উপমহাদেশের বহুল প্রচারিত ভয়ঙ্কর অপবিজ্ঞান জ্যোতিষবিদ্যার মতোই পরামনোবিদ্যা একটি নতুন সংযোজন মাত্র।

এবার মূল আলোচনাতে আসি। (i) দূরচিন্তা, নাম শুনেই বোঝা যায় বিষয়টা কী। পরামনোবিদ্যার ঝাঙাধারী

---

\* শিরোনাম কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইল।

বিজ্ঞানী-মহাপুরুষ-পুরুতদের দীর্ঘদিনের তুরূপের তাস হল এই দূরচিন্তা। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, — আমরা যখন চিন্তা করি, তখন মস্তিষ্ক থেকে রেডিও তরঙ্গের মতো এক ধরনের তরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকে; দূরের কোনো লোকের পক্ষে তার মস্তিষ্কের সাহায্যে এই তরঙ্গকে ধরে প্রেরকের চিন্তার হৃদিস পাওয়া সম্ভব, যদিও কাজটা একটু কঠিন। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, শব্দ বা আলোক তরঙ্গ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, গতি, মাত্রায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আমরা প্রয়োজন মত সেগুলো মাপতে পারি (যেমন, শব্দের গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩৩২ মিটার আর আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল)। রেডিও-টেলিভিশন এই শব্দ-তরঙ্গ ও আলোক-তরঙ্গকে ধরে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করে এবং পুনরায় আমাদের সামনে দৃশ্য ও শব্দ হিসেবে উপস্থাপন করে। কিন্তু 'চিন্তা' যে তরঙ্গ, এবং অন্য আরেক ব্যক্তির মস্তিষ্ক "গ্রাহকযন্ত্র" হিসেবে কাজ করতে পারে তা শুধু কল্পনাতেই রয়ে গেছে, বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি (পরামনোবিদ্যার ধারকেরা পর্যন্ত চিন্তা-তরঙ্গকে প্রমাণ করতে সক্ষম হননি)। তাই এই অস্তিত্বহীন চিন্তা-তরঙ্গকে ধরা এবং ভাব বুঝতে পারা নেহাতই অবাস্তব কল্পনা মাত্র। প্রাণির (বিশেষ করে মানুষের) মস্তিষ্কের একটি অংশ প্রিফ্রন্ট্যাল লোব (Prefrontal lobe), মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাথে জটিল ও স্বাভাবিক যোগাযোগের মাধ্যমে, প্রাণির চিন্তা-বিচার-বুদ্ধি-মেধা ইত্যাদির বিকাশে কাজ করে থাকে এবং নিয়ন্ত্রণও করে থাকে। কিন্তু কোনো কারণে অপুষ্টি অথবা কোনো রোগের ফলে যদি এই অংশের অসম্পূর্ণ বিকাশ ঘটে, তবে প্রাণির মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ নাও হতে পারে, বিভিন্ন ধরনের মানসিক অস্বাভাবিকতা দেখা দিতে পারে। এই লোব থেকে চিন্তা কোনো ধরনের তরঙ্গ আকারে নির্গমন হচ্ছে— (এবং তাতে টেলিপ্যাথির কাজ হচ্ছে) বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করেননি, বা এই ধরনের কোনো দাবিও করেননি। তাছাড়া এই ধরনের তরঙ্গের অস্তিত্ব এক প্রকারে অসম্ভবও। স্নায়ুবিজ্ঞান বলে—শব্দশক্তি বা আলোকশক্তির মতো চিন্তা কোনো শক্তি নয়, ভেসে বেড়াবার বস্তু নয়—স্নায়ুক্রিয়ারই একটি ফল মাত্র। এরপরও কিছু ব্যক্তি (বিশেষ করে পরামনোবিদরা) বিভিন্ন সময়ে টেলিপ্যাথির সফল পরীক্ষা চালিয়েছেন বলে জোর গুজব রয়েছে। এ সকল গুজবের মধ্য থেকে একটি মাত্র উদাহরণ তুলে ধরছি এখানে— ১৯৫৯ সালের ২৫ জুলাই ড. জে বি রাইন দাবি করেন, তিনি টেলিপ্যাথির সাহায্যে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আণবিক শক্তিকালিত সাবমেরিন 'ন্যাটিল্যাশ'-র খবর পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। এবং তাঁর এ পরীক্ষার সাথে যুক্ত ছিলেন আমেরিকার বিমানবাহিনীর সদস্য উইলিয়াম বাওয়ার। পরীক্ষার সময় ন্যাটিল্যাশ ছিল না-কি ১২০০ মাইল দূরে জলের তলায়। ড. রাইনের এ বক্তব্যের সত্যতা যাচাই-বাছাইয়ে সময় নষ্ট না করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলো পড়ি-মরি করে বাজাতে লাগল পরামনোবিদ্যার দিগ্বিজয়ের দামামা। সাধারণ মানুষ থেকে বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত সকলেই এ স্টান্ট নিউজের কবলে পড়ে বিভ্রান্ত হতে লাগলেন। কিন্তু সত্য তো আর বেশি দিন চাপা থাকে না। ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের *দিস উইক* পত্রিকার তরফ থেকে যখন টেলিপ্যাথির ওপর রিপোর্ট ছাপাতে তথ্য সংগ্রহ করতে গেল, তখনি বেড়িয়ে এল "কেঁচো খুঁড়তে সাপ"। ন্যাটিল্যাশ সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম অ্যান্ডারসন পরিষ্কার করে জানান, ১৯৫৯ সালের ২৫ জুলাই ন্যাটিল্যাশ ছিল ডকে, কিছু সারাইয়ের কাজ চলছিল। আর আজ পর্যন্ত টেলিপ্যাথির কোনো পরীক্ষা ন্যাটিল্যাশে চালানো হয়নি। এরপর *দিস উইক* পত্রিকাটি যখন টেলিপ্যাথির সঙ্গে যুক্ত বলে কথিত মার্কিন বিমান বাহিনীর উইলিয়াম বাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করল, তিনিও জানালেন—টেলিপ্যাথির কোনো পরীক্ষার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন না এবং ৫৯ সালের ২৫ জুলাই তিনি ন্যাটিল্যাশে ছিলেন না, বরং ছিলেন বিমান বাহিনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে। হায়রে দুনিয়া! চাপার জোর থাকলে যে, কত কিছুই করা সম্ভব, তারই নমুনা এটি। টেলিপ্যাথি নিয়ে আরো প্রতারণামূলক খবর জানতে, আগ্রহীরা পড়ুন : প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৭১। এবং ভবানী প্রসাদ সাহু, *ভূত ভগবান শয়তান বনাম ড. কোভুর, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১২১-১২৬।*

(ii) প্রায় সব ধর্মের অবতার, জ্যোতিষী, মহাপুরুষ ইত্যাদি লোকেরা ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতা রয়েছে বলে জাহির করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করতে পারেনি যে ভবিষ্যদ্বাণী বলে কারো

কোনো ক্ষমতা রয়েছে, বরং যারাই সাহস করে এই ক্ষমতার পরীক্ষা দিতে গেছে, তাদের বুজরুকি হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় কীভাবে এই বুজরুকের দল ভবিষ্যতের বক্তব্য বলে? আসলে বিষয়টি তেমন কিছুই না—পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী আর বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ করে কয়েক বছর পর কি ঘটতে পারে, তার একটা আভাস সবসময়ই পাওয়া যায় (বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক, কলাম লেখকেরা এরকম প্রতিনিয়তই করে আসছেন); কোনো কোনো সময় এই আভাস বা অনুমান সম্ভাব্যতার নিয়মে (Law of Possibility) মিলে যায় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা মিলে না। পাঠক, আপনার নিজের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকান, এরকম ঘটনা প্রচুর খোঁজে পাবেন। প্রায়শই দেখা যায়, ধর্মীয়গুরু যখন কোনো বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করেন এবং সেই বাণীটি ব্যর্থ হয় তখন আমরা ভুলে যাই, ধর্মীয়গুরুর ভুল হিসেবে স্বীকার করতে চাই না। কিন্তু কোনো কারণে যদি একবার ভবিষ্যদ্বাণীর কিঞ্চিৎ পরিমাণ মিলে যায়, তখন আমরা ঢাক-ঢোল নিয়ে বের হয়ে যাই গুরু-বন্দনা করতে করতে। অথচ নির্মোহ হয়ে হিসেব করলে দেখা যাবে, মহাপুরুষদের ভবিষ্যদ্বাণী (যা আপনি-আমি সর্ব্বলেই কম-বেশি ধরি মাছ, না ছুঁই পানি—ধরনের বক্তব্য দিতে পারবো) বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার পরিমাণ বা মিলে যাওয়ার সংখ্যা থেকে না-মিলে যাওয়ার সংখ্যা হাজার হাজার গুণ বেশি। তবে গুরুর প্রতি আমাদের অন্ধভক্তি-বিশ্বাস উবে গেলে, পাপে নিমজ্জিত হওয়া ও পরকালে নরক যাওয়ার ভয়ে না-মিলা ঘটনাগুলো কাউকে বলি না; চাপা দেই নিজের স্মৃতিভাণ্ডারে। এখানে প্রাসঙ্গিক যে, উপমহাদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ ড. আব্রাহাম থোম্মা কোভুর আমাদের জানিয়েছেন—একজন সফল (ধুরন্ধর) ধর্মগুরু/অবতার/পয়গম্বর/পিরবাবা হওয়ার জন্য কী কী গুণ/কৌশলের প্রয়োজন<sup>(১১)</sup>;—**প্রথমত**, প্রয়োজন কিছু অর্থহীন গালভরা বুলি উপযুক্ত দক্ষতার সঙ্গে ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে তোতাপাখির মত আউরে যাওয়ার ক্ষমতা—যেমন, আত্মমুক্তি, আত্মরক্ষা, আত্মোপলব্ধি, ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরমপ্রাপ্তি, দৈবশক্তি, অতীন্দ্রিয় মানস, কর্মযোগ, মোক্ষ, নির্বাণ ইত্যাদি। **দ্বিতীয়ত**, ম্যাজিসিয়ানসুলভ কয়েকটি লোক ঠকানো কৌশল আয়ত্ত করা; যেমন শূণ্যে হাত নেড়ে ফুল, সুগন্ধিযুক্ত ছাই, সন্দেশ বের করা, নিজের নাড়ী 'বন্ধ' করে দেওয়া, কারো পোশাকের ভিতরে কি আছে অথবা বাড়িতে কি ঘটেছে তা আচমকা বলে দিয়ে চমকে দেওয়া ইত্যাদি। পাশাপাশি এসবের সঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত বা উদাস চাউনি, এলোমেলো পোশাক, পাগল-পাগল ভাব, কিছু অস্বাভাবিক আচরণ যেমন নিজের মল-মূত্র খেয়ে ফেলা বা এই ধরনের অস্বাভাবিক কোনো কিছু, আর কথাবার্তার মধ্যে যদি আকর্ষণীয় উপস্থাপনভঙ্গি থাকলে তো আর কথাই নেই! **তৃতীয়ত**, যা সবচেয়ে দরকারী তা হল কিছু প্রচারক দালাল। এরা ঐ ধর্মগুরু/অবতার/পয়গম্বরের মাহাত্ম্য সম্পর্কে নিজের ও অন্যদের (অধঃসত্য-সম্পূর্ণ মিথ্যা) অভিজ্ঞতার কথা মুখে-মুখে, সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচারযন্ত্রে, তাদের গল্প-কবিতা-উপন্যাস ইত্যাদি 'সাহিত্য-কীর্তির' মাধ্যমে রগরগে ভঙ্গিমায়ে প্রচার করবে। একাজ করার জন্য কখনো তাদের সাথে আর্থিক ভাগবাঁটোয়ারার চুক্তি করতে হবে অথবা কৌশলী আচরণে ওদের মধ্যেও সরল-নির্বোধ বিশ্বাস জন্মাতে হবে (অর্থাৎ পটাতে হবে)। **চতুর্থত**, প্রয়োজন বিপুল সংখ্যক সরল-বোকা-অধঃশিক্ষিত-অশিক্ষিত-যুক্তিবুদ্ধিহীন-অসহায়-নির্বোধ ধর্মবিশ্বাসীর দল। যারা প্রণামী, নৈবদ্য ও সরল বিশ্বাস নিয়ে পয়গম্বর/অবতার/পিরবাবার ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলবে নির্দিধায়। আমাদের চারপাশের গরীব দেশগুলিতে এরকম অসহায় লোকের তো অভাব নেই বরং ওদের সংখ্যাই বেশি। ড. কোভুরের সাথে একমত পোষণ করে ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু আরেকটি কৌশলের কথা বলেছেন; তিনি বলেন—**পঞ্চমত**, অবতার/পয়গম্বর/পিরবাবার লোকঠকানো ধর্মব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থের কিয়দংশ স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল ইত্যাদি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কাজে অথবা দুর্যোগ পীড়িত সাধারণ মানুষের ত্রাণকার্যে ব্যবহার করতে হবে। এতে করে বিপুল পরিমাণ সাধারণ মানুষ থেকে গুরু করে দেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীদের আস্থা, সম্মান, সহানুভূতি, সম্ভ্রম আদায় হয়; যা ঐ ধর্মব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে অত্যাৱশ্যকীয়। আশা করি পাঠকের চারপাশে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মিশনারি কাজকারবার দেখে উদাহরণের অভাব হবে না। আর আমাদের (বিশেষ করে বাঙালিদের মধ্যে) একটি মারাত্মক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গুজবে কান দেয়া<sup>(১২)</sup>; মূল ঘটনা

কী, সেটা ভালোভাবে খোঁজ-খবর না করে "যাহা রটে তা কিছু কিছু বটে" — ধরে নিয়ে "চিলের পিছনে" ছুটতে থাকি। আমাদের এই ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত প্রপাগান্ডায় সম্পূর্ণ মিথ্যার বেসাতি দ্বারা তৈরি অলৌকিকতার প্রচার হয়, আর সাধারণ লোকে "বেশি লোক বলাবলি করছে দেখে" — বিশ্বাস করে, সত্যি বলে ধরে নেয়।

এখন আমরা দেখি, কী করে একজনের মুখ দেখে তার সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যায়<sup>(১৩)</sup>; অনেক সময় তা প্রায় মিলেও যায়। এ কাজটি সবচেয়ে বেশি করে থাকেন ধর্মগুরু/জ্যোতিষি/পিরবাবা/পয়গম্বর ইত্যাদি কিসিমের লোকেরা। প্রথমেই স্পষ্ট করে বলে নিই, — ওঁদের এই বলার মধ্যে নেই কোনো অলীক ক্ষমতা, স্রেফ আছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, মানুষকে যাচাই করার ক্ষমতা, আর উপস্থিত বুদ্ধি। তো এবার একজন ব্যক্তির চরিত্র বিশ্লেষণ করা যাক; — যার সম্পর্কে বলবেন, তার মধ্যে সর্বপ্রথম আপনার প্রতি আস্থা জন্মাতে হবে, এজন্য কিছু (প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক) ভালো ভালো কথা সুন্দর করে গুছিয়ে উপস্থাপন করতে হবে (কখনোই জটিল কোনো বিষয় নিয়ে আলাপ শুরু করবেন না), পাশাপাশি কৌশলে ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা, কর্মক্ষেত্র, পরিবারের অবস্থা, বিবাহিত না অবিবাহিত, পছন্দনীয় বিষয়, শখ ইত্যাদি জেনে নিতে হবে (সবকিছু না জানলেও ক্ষতি নেই), পরিমিত মাত্রায় হাসতে হবে, ব্যক্তির মনযোগ আপনার প্রতি নিবদ্ধ করার জন্য এগুলো করতে হবে এবং ব্যক্তির চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে। ব্যক্তি যদি গড়-মধ্যবিত্ত ধরনের বলে মনে হয় (অর্থাৎ পোশাক, চেহারা, চুলের স্টাইল ইত্যাদি দেখে এরকমই লাগে), তবে তাকে এভাবে বলুন: — "আপনার মানুষ চেনার ক্ষমতা সহজাত, আপনি সবার জন্যই কিছু করতে চান বিশেষ করে আপনার পরিবারের জন্য; এবং আপনি সুযোগ মত করেনও, তবে এর বিনিময়ে তাঁদের কাছ থেকে আশানুরূপ কৃতজ্ঞতা-অভিনন্দন পান না এবং পাবেন না। কর্মক্ষেত্রেও আপনার একই অবস্থা; প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বারে বারে বঞ্চিত হচ্ছেন। আপনার বন্ধুদের মধ্যে শুভার্থী যেমন আছেন, তেমন ঈর্ষাপরায়ণও কেউ কেউ আছেন। তাদের কাছ থেকে আপনাকে সাবধান থাকতে হবে। আপনি বহু অর্থ সমস্যাতে নানা সময়ে ভুগেছেন এবং শেষ পর্যন্ত উদ্ধারও পেয়েছেন। আপনার বিভিন্ন বিপদে প্রত্যাশিত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রত্যাশিত পরিমাণ সাহায্য পান নাই বরং অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিও আপনাকে সাহায্য করেছেন এবং আগামীতে করবেনও।" আমাদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে — অন্যের মুখ থেকে প্রশংসা শুনলে আমরা খুশি হয়ে উঠি; এই প্রশংসার বিষয় সত্যি না হলেও কিছু যায় আসে না, আমাদের ক্ষেত্রে তা সত্যি বলে ধরে নিই। "সংসারের জন্য, কর্মক্ষেত্রের জন্য যতই করুন না কেন, যতটা সম্মান আপনার প্রাপ্য ততটা পাচ্ছেন না" — এই ধরনের কথাটা শুনতে নারী-পুরুষ সকলেই ভালোবাসে এবং সবসময় মনে করে সে প্রাপ্য সম্মানের কিছু কম পাচ্ছে কিংবা তার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না ইত্যাদি। আর মধ্যবিত্ত রোজগারি ব্যক্তি যে নানা সময়ে আর্থিক সমস্যাতে পড়বেই এবং উৎক্রান্ত হবে, সেটা বলাই বাহুল্য। আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি, বিপদে পড়লে অনেক সময় নিকট পরিচিত/কাছের বন্ধু পিছুটান দেয় এবং অর্ধপরিচিত ব্যক্তি বা বন্ধু এগিয়ে আসে। এটা সবার ক্ষেত্রে কম-বেশি ঘটে থাকে। শিক্ষিত, সুন্দরী নারী সম্পর্কে বলতে হলে নিদ্বিধায় বলতে পারেন — "আপনার কাছে অনেকেই প্রেম নিবেদন করেছেন এবং বেশিরভাগকে আপনার যোগ্য বা পছন্দ হয়নি।" কিংবা একটু ঘুরিয়ে বলতে পারেন, "আপনার গুণমুগ্ধ পুরুষের সংখ্যা অনেক।" বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় শিক্ষিত-অধিশিক্ষিত-অশিক্ষিত, সুন্দরী-অর্ধসুন্দরী নারীর জীবনে একাধিক পুরুষের আবির্ভাব প্রায় ধ্রুবসত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুরুষদের দেখেও এরকম প্রেমের কথা বলে দেয়া সম্ভব; সুদর্শন, স্মার্ট, বাকপটু কিংবা লোফার মার্কা ছেলেদের জীবনেও একাধিক নারী আসাটা স্বাভাবিক ব্যাপার।

যাঁকে দেখে রাগী বলে অনুমান করবেন, তাঁর সম্পর্কে বলতে পারেন, — "আপনি সাধারণতঃ সহজ-সরল পথে চলতে ভালোবাসেন, কিন্তু প্রয়োজনে বাঁকা পথও ধরতে পারেন। আপনি রেগে গেলে সাংঘাতিক হয়ে ওঠেন কিন্তু কখনোই বুদ্ধির বিভ্রম ঘটে না।" দেখবেন যাঁর সম্পর্কে বলেছেন, খুশিতে তিনি একদম বাক-

বাকম হয়ে যাবেন, তখন আপনি গুণমুখ শ্রোতার চোখে, শ্রোতার প্রচারে অন্যদের চোখেও হয়ে উঠবেন দারুণ ভবিষ্যদ্বক্তা। আসলে তোষামোদে সকলেই খুশি হয়, নিজের সম্বন্ধে ভালো কথা শুনলে মনের মধ্যে খুশির জোয়ার চলে আসে এবং না-মেলা কথাগুলো একদমই ভুলে যাই। আবার ব্যক্তি যদি ধনী হন (অর্থাৎ পোষাক-পরিচ্ছদ, চেহারা, গলায় চেন, হাতে আঙটি ইত্যাদি দেখে মনে হলে), তবে বলুন, "আপনার মানুষ চেনার ক্ষমতা অসাধারণ, আত্মবিশ্বাসী, দৃঢ়চেতা। অনেকে আপনাকে ঈর্ষা করে এবং অনেকেই আপনাকে শ্রদ্ধা করে। অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন সহজেই। জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মোকাবেলা করেছেন, এমনিতে মানুষের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক আছে কিন্তু প্রয়োজনে রুঢ় হতেও জানেন। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে, প্রায়ই বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না, তবে নিত্য নতুন বন্ধুর আগমন হয়। ইত্যাদি।" ধনীব্যক্তি ব্যবসায়ী হলে (সবার জীবনেই কম-বেশি) তো লাভ-লোকসান আছেই অর্থাৎ ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করতেই হবে। এছাড়া ব্যবসায়ী ব্যক্তি কিংবা রাজনীতিবিদকে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করতেই হবে, এবং এক ধাপ উত্তরণের সঙ্গেই পুরানো অনেকেই বিদায় নেন। ধনীব্যক্তিকে অনেকে (বিশেষ করে গরীব আত্মীয়-স্বজনেরা) ভয় পেয়ে শ্রদ্ধা করে আর প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক ধনী ঈর্ষা করতেই পারে।

এভাবে মানুষের নানা শ্রেণিবন্যাসের ওপর নির্ভর করে এমনি কত কিছুই যে ঠিক-ঠাক বলে দেওয়া যায়, সে নিয়ে একটা মহাভারত রচনা করা যাবে। আমাদের আশেপাশের ভণ্ড-বুজরুক জ্যোতিষী/পির/মহাপুরুষ কথিত অলীক কারসাজি ব্যতিরেকে এরকমই মনুষ্যচরিত্র বুঝে বা আন্দাজ করে নানা বক্তব্য দিয়ে থাকে। যা অনেক ক্ষেত্রে মিলে যায়, অনেক ক্ষেত্রে যায় না। না মিললে বয়েই গেল। যাদের মেলে, প্রচার তো তারাই করে। অতএব "মা ভৈ"! কিন্তু আপনি যদি কোনো জ্যোতিষী/পির/মহাপুরুষকে কোনো বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নির্দিষ্ট করে উত্তর দিতে, যেমন—বিখ্যাত জীবিত অমুক ঠিক কোন্ দিন মারা যাবে, অমুকের সাথে কার বিয়ে হবে, কতটি সন্তান হবে, অমুকের ব্যাঙ্ক একাউন্টে ঠিক কতো টাকা আছে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করেন (যদি ইনফরমার মারফত জানার সুযোগ না থাকে), তবে দেখবেন ঐ জ্যোতিষী/পির/মহাপুরুষ নির্ঘাত পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইবেন না; আর বেশি চাপাচাপি করলে চালাকি করে এমন ভাসাভাসা উত্তর দিবেন যে—মিলতেও পারে আবার নাও মিলতে পারে।

(iii) অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবিদারদের মতে, ক্লেয়ারভয়ান্স (Clairvoyance) শক্তির সাহায্যে বহু দূরের ঘটনা দেখা ও শোনা সম্ভব। প্রায়ই বিভিন্ন পির/মহাপুরুষেরা এমনটা দাবি করে থাকেন তাদের ভক্তদের কাছে। পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য প্রবীর ঘোষের বই<sup>(১৪)</sup> থেকে একটি ছোট্ট উদাহরণ তুলে ধরিছি;—কলকাতার এক প্রবীণ সাংবাদিক এক বাঙালি তান্ত্রিকের পরম ভক্ত। ঐ সাংবাদিক বিদেশে একবার অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য কয়েকদিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। ফিরে এসে ঐ সাংবাদিক যখন তাঁর গুরুর কাছে ঘটনাটি বললেন, তিনি বললেন, "ওরে সে আমি দেখেছি। তোর ঘরে যে নার্স মেয়েটি ফুল রেখে যেত, সে বড় ভালোরে।" তান্ত্রিকবাবার ঐ এক কথাতেই বাজিমাৎ। সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ সাংবাদিক বিশ্বাস করে ফেললেন, তান্ত্রিকবাবার নির্ঘাত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। নয়তো গুরুজী বললেন কীভাবে, সাংবাদিকের কেবিনে রোজ নার্স ফুল রেখে যেত, সে বড় ভালো। আসলে ঐ সাংবাদিকের মধ্যে গুরুভক্তি এতোই প্রবল ছিল যে, গুরুর মুখ থেকে শোনার পর তাঁর মধ্যে আর যুক্তিবোধ কাজ করেনি। তিনি গুরুর কথাকেই পরমসত্য (Absolute truth) বলে ধরে নিলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিকমান সম্পন্ন যে কোনো হাসপাতালের কেবিনের ফুলদানিতে ফুল থাকে, আর নার্সের কাজ তো রোগীদের সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা করা—এটুকুই জানা থাকলেই যে এ ধরনের কথা বলা যায়, তা ঐ সাংবাদিকের মতো অন্ধবিশ্বাসীকে কে বোঝাবে? আবার ধরুন, আপনি বা আমি অন্য একজন ব্যক্তি সম্পর্কে মোটামুটি জানি, যেমন,—ঐ লোকটি কখন-কোথায় যাতায়াত করেন, রাতে কখন ঘুমাতে যান, কী ধরনের খাবার

পছন্দ করেন, কী ধরনের পোষাক পড়তে ভালোবাসেন, কী ধরনের বই পড়েন, কখন পড়েন, কার-কার সাথে ভালো সম্পর্ক আছে, কার-কার সাথে খারাপ সম্পর্ক আছে, অবসর পেলে তিনি সাধারণত কী করেন, পরিবারে কে-কে আছে, তাঁরা কী করেন ইত্যাদি। তাহলে, আমরাও সময়-সুযোগমতো ঐ লোকটি সম্পর্কে এমন কিছু বলে দিতে পারবো, যা সত্যিই মিলে যাবে; অথবা উপস্থিত সময়ে আচরণ বিশ্লেষণ করেও কিছু-কিছু বলে দেয়া সম্ভব, যা মিলে যেতে পারে। আর ঐ লোকটির মধ্যে যদি অলৌকিকতার প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকে, তবে তো তিনি নির্ঘাত ধরে নিবেন—আমাদের মধ্যে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে! বন্ধু-বান্ধবের সাথে স্রেফ মশকারা করার জন্য (অলৌকিকতা প্রচারের জন্য নয়) এরকম খেলা আমরা সবাই কম-বেশি করেছি নানা সময়। দেখছি—সবচেয়ে ভালো হয়, খুব কাছের বন্ধুকে এরকম খেলা না দেখিয়ে (কারণ সেও আপনার সম্পর্কে কম-বেশি জানে, ফলে ঐ বন্ধুকে আর বিস্মিত করা যাবে না) একটু অল্প-অর্ধ পরিচিত লোক সম্পর্কে আগেই অন্য কারো (অন্য বন্ধু-বান্ধব) মারফত জেনে নিয়ে, ঐ অল্প-অর্ধ পরিচিতের সামনে ছট-হাট বলে দিলে তাঁর আর বিস্ময়ের সীমা থাকে না; তখন খেলাটা জমে ভালো।

আসলে ঐ টেলিপ্যাথিই বলেন, ভবিষ্যদ্বাণীই বলেন আর অতীন্দ্রিয়দৃষ্টিই বলেন, এই সকল তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় যারা দেয় বা দাবি করে, তারা নিজেদের বুদ্ধিদীপ্ত অনুমান, বিশ্লেষণ এবং মাঝে মাঝে কিছু লৌকিক কৌশল প্রয়োগ করে বলে মাত্র—এগুলির কয়েকটি মিলেও যেতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটির মধ্যে বিন্দুমাত্র ঐশ্বরিক কোনো ক্ষমতা নেই। সত্যি কথা হচ্ছে, আমরা সাধারণ জনগণ "মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ-উপস্থিত বুদ্ধি খাটুনির কৌশল" জানি না বলেই, অন্যের মুখ থেকে নিজের সম্পর্কে দু-একটা বক্তব্য মিলে গেলে ধান্দায় পড়ে যাই। তা পাঠক, এই যে লৌকিক কৌশলের কথা বললাম সেটা কী; এটা হচ্ছে আশেপাশের ম্যাজিসিয়ানরা সচরাচর দর্শকদের জাদু দেখিয়ে তুষ্ট করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করে থাকে, সেটাই। একটা উদাহরণ দেই,—প্রচলিত আছে, ইজারাইলি বিমান বাহিনীর সাবেক সদস্য, বর্তমানে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতারবাণ্যধারী ইউরি গেলার এবং তাঁর গডফাদার ডক্টর আন্দ্রিজা পুহারিচ না-কি অনেক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে এসে সবাইকে তাজ্জব করে দিয়ে তাঁদের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির প্রমাণ দিয়ে গেছেন! শোনা যায় ইউরি গেলার সীল দিয়ে বন্ধ করা একটা মোটা খামের ভিতর রাখা ছবির বর্ণনা প্রতিবারই সঠিক দিয়েছেন। খামটিকে এমন পুরু করে রাখা হয়েছিল যাতে তীব্র আলোর সামনে খামটিকে ধরলেও ভিতরের ছবি ফুটে না ওঠে। চমকে যাওয়ার মতো বিষয়, কীভাবে সম্ভব। কিন্তু ম্যাজিসিয়ানদের কাছে ঐ বিষয়টি আসলে কিছুই না। গেলার যা করতেন তা হলো, দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে সীল করা খামটি ডুবিয়ে দিতেন অ্যাবসিলিউট অ্যালকোহল বা রিফাইন্ড স্পিরিটে। এতে সামান্য সময়ের জন্য খামটা স্বচ্ছ হয়ে যায়, এবং ভেতরের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দর্শকদের চোখের আড়ালে খামের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিলেই হয় তখন। তারপর একটু সময় পর যখন ঐ অ্যাবসিলিউট অ্যালকোহল বা রিফাইন্ড স্পিরিট উবে গিয়ে আবার অস্বচ্ছ হয়ে গেল তখন অলৌকিক কোনো কাজ করছি এমন একটা "ভাব" নিয়ে খামের ভিতরে রাখা ছবির বর্ণনা দিতেন। ব্যাস। আবার ইউরি গেলারের ম্যানেজার Yasha Katz গোপন খবর ফাঁস করে দিয়ে জানিয়েছেন, আগের পদ্ধতিটি ঠিক মতো ব্যবহার করা সম্ভব না হলে, এই Katz-ই কৌশলে গোপন খামগুলো খুলে তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনুষ্ঠানের আগেই গেলারকে জানিয়ে রাখতেন। এরপর অনুষ্ঠান শুরুর পর গেলার ভাব নিয়ে ছবির বর্ণনা দিতেন।

(iv) লোকমুখে প্রচলিত আছে, মানসিক বা চিন্তাশক্তির "অলৌকিক" ক্ষমতার মাধ্যমে কোনো জড়বস্তুকে স্থির কিংবা গতিশীল করা, কোনো ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা কোনো বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন করা যায়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও রয়েছে এ নিয়ে নানা নিশান আর সাথে-সাথে বিভিন্ন মহাপুরুষ/পিরের জীবনীতেও জড়িয়ে রোমাঞ্চকর সব ঘটনার কথা। বিশেষ করে মানসিক শক্তি দিয়ে রেলগাড়ি আটকে দেয়ার 'গম্পো' অনেকের কাছেই বোধহয় নতুন নয়। মনে আছে ছোটবেলায় ভারতের এক মহাপুরুষের জীবনী নিয়ে তৈরি এক বাংলা

সিনেমাতেও এরকম ঘটনা দেখেছি। তখন বিষয়টি বিশ্বাসও করে ফেলেছিলাম। ভাবতাম, সাধু-সন্ন্যাসী-পিরদের নিশ্চয়ই এরকম নানা অলৌকিক ক্ষমতা আছে। বিশেষ করে, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এরকম প্রচুর সাধু-সন্ন্যাসীর বর্ণনা আছে, মানসিক শক্তির দ্বারা তাঁরা যখন খুশি-যেখানে খুশি চলে যেতে পারেন, যাকে খুশি ইচ্ছেমত শরীরের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারতেন। যেমন—পদ্মপুরাণে আছে মুনি গৌতম একবার বাহির থেকে এসে দেখলেন, তাঁর স্ত্রী অহল্যা আর দেবরাজ ইন্দ্র ফষ্টিনষ্টি আর রমণে লিপ্ত। মুনি গৌতমের সহ্য হল না; তিনি অভিশাপ দিলেন, অহল্যা পাথর হয়ে গেল আর দেবরাজ ইন্দ্রের সর্বাপেক্ষে হাজারটি ভগ্ন (যোনি) উৎপন্ন হল! এজন্যই হয়তো হিন্দুরা ইন্দ্রকে "ভগবান" বলে থাকে!; আবার আরেক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাঁদের ধর্মের শেষ মহাপুরুষ একবার বিধর্মীর কাছে নিজের প্রচারিত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আঙুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিলেন! যাহোক—আধুনিককালে বিজ্ঞানের পরিচিত শক্তিগুলোর মধ্যে আছে বিদ্যুৎ শক্তি, চৌম্বক শক্তি, শব্দ শক্তি, আলোক শক্তি ইত্যাদি। এগুলোকে আমরা দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে আসছি। কিন্তু অদ্যাপি মানসিক শক্তি বা চিন্তা শক্তির খোঁজ বিজ্ঞানের জানা নেই; সহজ কথা হচ্ছে বিজ্ঞান এর অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অর্থাৎ বিজ্ঞানের অন্যান্য শক্তির মতো চিন্তাশক্তির মাধ্যমে আমরা বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালাতে পারব না, পারব না বৈদ্যুতিক ফ্যান চালাতে, পারবো না কোনো মোটরগাড়ি-সাইকেল থামাতে বা চালাতে, সম্ভব নয়—একটি চামচ বাঁকিয়ে দেয়া, একটি গাড়িকে শূন্যে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেয়া ইত্যাদি। আগেই উল্লেখ করেছি, চিন্তা হলো প্রাণির মস্তিষ্কের স্নায়ুক্রিয়ার ফল। এবং এই স্নায়ুক্রিয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র স্বদেহেরই রক্তের চাপ বাড়তে পারে-কমতে পারে, মাথা গরম হতে পারে, হজমে গোলমাল হতে পারে, হাঁপানি বেড়ে যেতে পারে-কমতে পারে, দাঁতের ব্যথা, আলসার হতে পারে, ঘুম কম-বেশি হতে পারে, ক্ষুধামান্দ্য দেখা দিতে পারে ইত্যাদি। আর এগুলো হওয়ার কারণ হচ্ছে,—এ বিষয়গুলি সরাসরি আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ স্নায়ুতন্ত্রের জটিল গঠন-ব্যাপ্তির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোনোভাবেই শরীরের বাইরে কোনো কিছুকেই চিন্তাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না; কারণ এটি শরীরের বাইরে প্রবাহিত হয় না। অধুনা বিভিন্নজনের সম্পর্কে শোনা যায়, তারা না-কি এই মানসিক বা চিন্তাশক্তি দিয়ে ধাতব চামচ বাঁকিয়ে দিয়েছেন, চলন্ত ট্রেন থামিয়ে দিয়েছেন, কেবল-কার থামিয়ে দিয়েছেন, লিফট থামিয়ে দিয়েছেন, চলন্ত স্টিমারও থামিয়ে দিয়েছেন। এগুলো করা হয়েছে মূলত আরো আট-দশটা ম্যাজিসিয়ানসুলভ কারসাজি দিয়ে; এর বেশি কিছু না। যেমন:—ভারতের বিখ্যাত জাদুসম্রাট পি সি সরকার একবার নারায়ণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ যাওয়ার জন্য স্টিমারে করে যাচ্ছিলেন। পথে স্টিমারের যাত্রীদের সস্তা বিনোদনের জন্য কিংবা তাজ্জব করার উদ্দেশ্যে মাঝনদীতে স্টিমার থামিয়ে দিলেন। দর্শকেরা দেখলো জাদুসম্রাট সরকার কুম্ভক যোগের মাধ্যমে মানসিকশক্তি প্রয়োগ করে স্টিমার থামিয়ে দিয়েছেন। জাদুকরের এহেন অতীন্দ্রিয় কীর্তি দেখে চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেল, অবাক দর্শক ঘন হাতাহালি দিতে লাগল। কথা হচ্ছে অতীন্দ্রিয় কীর্তি-টার্টি কিছুই নয়, জাদুসম্রাটের ক্ষমতার চাবিকাঠি ছিল স্টিমারের সারেঙের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল। যাত্রীদের সাথে মজা করার উদ্দেশ্যে জাদুকর আগেই স্টিমারের সারেঙদের সাথে আলাপ করে কৌশল ঠিক করে নিয়েছিলেন, তারপর তো সেই কৌশল অনুযায়ী কাজ। তাও তো ভালো, জাদুকরের এমন কাণ্ডকে যাত্রীরা শুধু সস্তা বিনোদন হিসেবে নিয়েছে, কোনো অলৌকিক মহাপুরুষের কীর্তি হিসেবে নেয়নি, নয়তো আরেকটি কুসংস্কারের চারা রূপিত হতো যাত্রীদের মনে। ঠিক এমনিভাবেই যাদের সম্পর্কে শোনা যায় ট্রেন আটকে দিয়েছে মানসিকশক্তির প্রয়োগ করে, তারা এগুলো করে থাকেন আগে থেকে ড্রাইভার ও তার সাগরেদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে। এতে দুপক্ষেরই লাভ। গুরুজির অলৌকিক কীর্তি প্রচারিত হলে তাঁর ভক্ত সংখ্যা বাড়বে, প্রণামী বাড়বে আর ড্রাইভার ও সাগরেদরা এই ফাঁকে গুরু কাছ থেকে দুপয়সা কামাতে পারবে। তেমনিভাবে বিখ্যাত (?) পরামনোবিদ ইউরি গেলারের "অতীন্দ্রিয় মানসিক বা চিন্তাশক্তি"-র মাধ্যমে লিফট, কেবল-কার থামিয়ে দেয়া, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সাজিয়ে দর্শকদের সাথে নাটক করা হতো। আর গেলারের কুকীর্তিগুলি ইউরোপ-আমেরিকার পত্র-পত্রিকা, টিভি মিডিয়ার সাংবাদিকেরা

অতীন্দ্রিয়তার নাম ভাঙিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে পরিবেশন করতো। তবে আমাদের জন্য সুখবর, সত্যানুসন্ধানী ম্যাজিসিয়ান জেমস র্যান্ডি "দি ম্যাজিক অব ইউরি গেলার" নামক একটি বই লিখে গেলারের হাতে হাড়ি ভেঙে দিয়েছেন। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, ইউরি গেলার যেসব কাজ করে দেখাতেন এবং অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার পরিচয় হিসেবে জাহির করতেন, সেগুলি আসলে ছিল ম্যাজিসিয়ানসুলভ চাতুরী মাত্র; এবং এই বইয়ে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যা হোক, বাজার অর্থনীতির এ যুগে খবর যখন নেহাতই পণ্য, তখন মাঠের গরু যদি প্রচারের দৌলতে গাছে চড়ে বসে তবে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

পাঠক, এবার প্রবন্ধটি গুটিয়ে নেয়ার পালা; কী বুঝলেন। অতীন্দ্রিয়তা-অলৌকিকতা-অপার্থিবতা যা-ই বলি না কেন, তা সম্পূর্ণটাই সাজানো, কৃত্রিম, লোকদেখানো অভিনয় অথবা মানসিক ভারসাম্যহীনদের কাজকারবার। ক্ষমতাবানরাই নিজেদের কেদারা সুরক্ষিত রাখার স্বার্থে সময়ে-সময়ে আমাদের মস্তিষ্কে ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্ম, অতীন্দ্রিয়তার বাণী গেঁথে দেয়; এবং আপনার-আমার চারপাশের লোকেরাই সন্তাপ্রচারের মোহে, নিজেদের লাভের জন্য, শ্রেণিশোষণ টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই এ ভণ্ডামো-বুজবুজকি কাজ করে আসছে যুগ-যুগ ধরে। এরাই সমাজের খ্যাতিমান, এলিট শ্রেণির সদস্য; চলনে-বলনে-ভোগে তারাই অগ্রগণ্য আর ত্যাগে পশ্চাদসারিতে। কিন্তু জানি, এটাই শেষ কথা নয়, শেষ কথা বলবে জনগণ। তবে তার আগে এ ভণ্ডদের দীর্ঘদিনের সেবাপরায়ণতার-পবিত্রতার-নৈতিকতার-পাপ-পুণ্যের-পারলৌকিকতার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলতে হবে আপনাকে-আমাকে সবাইকে<sup>(১৫)</sup>।

### তথ্যসূত্র :

(৯) প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। ভবানী প্রসাদ সাহু, *ভূত ভগবান শয়তান বনাম ড. কোভুর*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা।

(১০) টীকা : "পরামনোবিদ্যা (Parapsychology)" নামটি অনেকের কাছেই পরিচিত। ইদানীং বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই এ নিয়ে লেখালেখি হচ্ছে। তবে দুঃখের কথা হচ্ছে, এ লেখালেখির ফলে আসল সত্যটুকু জানার চেয়ে এ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বেশি। কেন বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে? কারণটা জানার আগে দেখে নিই এই বিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয়গুলি কী কী। মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, জাতিস্মার, মৃতব্যক্তির আত্মার সাথে যোগাযোগ (Planchette), ঠিকুজী-কোষ্ঠী, রাশিবিচার, ভবিষ্যদ্বাণী, ব্ল্যাকম্যাজিক ইত্যাদি। প্রচারের দৌলতে কূটকৌশলী ধর্মতত্ত্ববিদ-পরামনোবিদরা দাবি করে থাকেন মনোবিজ্ঞান যেরকম একটি বিজ্ঞান তেমনিই পরামনোবিদ্যা একটি বিজ্ঞান; কিন্তু নামের মিল থাকলেই তো দুটি বিষয় এক হয়ে যেতে পারে না। যেমনটা জ্যোতিষশাস্ত্র (astrology) দাবি করে আসছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের (astronomy) মত বিজ্ঞানের একটি শাখা, কিংবা অধুনা যেমন বাইবেলিয় সৃষ্টিতত্ত্বে ভরপুর "ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন" দাবি করছে জীববিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত! তারা দাবি করলেই তো হল না, বিজ্ঞান চায় প্রমাণ। জ্যোতির্বিজ্ঞান যেমন তার শরীরে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা আবর্জনা (জ্যোতিষশাস্ত্র) ইতোমধ্যে ঝেড়ে ফেলেছে, মনোবিজ্ঞানও তেমনি দেহাতিরিক্ত আত্মা, মন ইত্যাদি অপার্থিব বিষয়কে ছেঁচে ফেলে দিয়েছে। এটি এখন বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মত সম্পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণের ওপর নির্ভরশীল এবং জীবের আচরণসংক্রান্ত অভিজ্ঞনতামূলক বিজ্ঞান। তারপরও পরামনোবিদরা নিজেদের বক্তব্যকে বিজ্ঞানসম্মত বলে যে সকল প্রমাণ হাজির করেছেন, তার কোনোটিই এ পর্যন্ত ধোপে টিকেনি। অনেকের ভিতর এ প্রশ্ন আসবে, এ বিদ্যা যদি অবৈজ্ঞানিক হয়, তবে তারে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? উত্তরটা এভাবে দেয়া যায়, এ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার অনেককিছুই অবৈজ্ঞানিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন (যেমন— চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণের সময় খাবার গ্রহণ করা যাবে না, নষ্ট করে ফেলতে হবে, জিন-ভূত-পেত্নি-দৈত্য-আত্মা-ঈশ্বর-



আল্লাহ-ভগবান ইত্যাদির অস্তিত্বে বিশ্বাস, তুক-তাক-বাণ মারা ইত্যাদি); কিন্তু এগুলো হাজার বছর ধরে টিকে আছে, শুধু টিকে আছে নয় বিপুল বিক্রমেই রাজত্ব করছে। পরামনোবিদ্যার অবস্থাও অনেকটা সেরকম। যাহোক, মূলত ১৯৭৪ সালের দিকেই এই ছদ্মবিজ্ঞানের (Pseudoscience) খুব রমরমা অবস্থা শুরু হয়, কারণ ঐ সালে যুক্তরাষ্ট্রের "American Society for the advancement of Science"-এ পরামনোবিদ্যার সংস্থা বিশেষকে সভ্য হওয়ার অনুমতি দেয়। যেমনটা — (অনেকের হয়তো জানা আছে), ভারতের বিজেপি সরকার ২০০১-এ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউ জি সি) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে "বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র"-কে বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করছে! মজার খবর হচ্ছে—পরামনোবিদ্যার পালে জোর হাওয়া থাকাকালীন সময়েই আমেরিকার নর্থ-ক্যারোলিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. জে বি রাইন এবং তাঁর স্ত্রী লুইসা ই রাইন পরামনোবিদ্যা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা (?) করেন ও পুস্তিকা প্রকাশ করেন, এবং একসময় ড. রাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরমনোবিদ্যা বিভাগের ডাইরেক্টর হন। কিন্তু পরবর্তীতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ড. রাইনের কথিত গবেষণার ফলাফল যাচাই-বাছাই করতে গিয়ে তাঁর গবেষণা কাজের অবৈজ্ঞানিক দিকটি ধরা পড়ে যায়, তখন ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য হয়ে ড. রাইনের "গবেষণা" কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এতেও দমে যান না ড. রাইন। তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং আরেক ধাপ্লাবাজ ওয়াল্টার লেভি মিলে নর্থ ক্যারোলিনা স্টেটের ডারহাম-এ গঠন করেন Institute of Parapsychology। ওয়াল্টার লেভি হন প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর। ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে ওয়াল্টার লেভি পরামনোবিদ্যার সফল পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের হাতে ধরা পড়ে যান। এই প্রতিষ্ঠানে যারা, তিনজন উদ্যোক্তা (গ্রেট ধাপ্লাবাজ)-র চাপাবাজিতে মুগ্ধ হয়ে পরামনোবিদ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং জড়িত হয়েছিল, তারাই পরবর্তীতে অতীন্দ্রিয় পরীক্ষার সফলতার পেছনে লৌকিক যান্ত্রিক কৌশল ও উদ্যোক্তাদের হাতসামান্যই এর কারবার রয়েছে, প্রকাশ করে দেয়। এভাবে জনসমক্ষে নিজেদের ভগ্নমো উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় ডাইরেক্টর ওয়াল্টার লেভি চূড়ান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় মিস্টার ও মিসেস রাইনকে ফেলে রেখে পালিয়ে যান। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এঁদের এহেন কর্মকাণ্ড সর্বসাধারণের সামনে বেআব্রু হওয়ার পরও সারা বিশ্বে পরামনোবিদ্যার চর্চা বন্ধ হয়নি। বরং সময়ে সময়ে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরো জানতে পড়ুন : প্রবীর ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৭। এবং ভবানী প্রসাদ সাহু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১৮-১২০।

(১১) ভবানী প্রসাদ সাহু, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯-৫১।

(১২) টীকা : গুজব বাঙালিসমাজের মধ্যে বেশ পরিচিত এবং ভয়ঙ্কর একটি শব্দ (হুজুগ শব্দটিও প্রায় কাছাকাছি অর্থবোধক); 'হুজুগে-বাঙালি' বলে আমাদের একটি বদনামও রয়েছে সারা বিশ্বে। এটা অনেকটা সংক্রামক ব্যাধির মতো, একবার আক্রান্ত হলে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব—যদি না গুজবগ্রস্তরা যুক্তিবোধ-বাস্তবনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়। চীনদেশি প্রবাদে আছে— "একটি গুজব একটি মাত্র কানে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু শতমুখে প্রচারিত হয়।" সাধারণভাবে গুজব বলতে আমরা বুঝে থাকি, "এক ধরনের অলীক বিবৃতি বা বক্তব্য, যা কখনো উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে, কখনো মানুষের প্রচারপ্রিয়তা অথবা রুদ্ধ আবেগের প্রকাশ সূত্র-ধরে, কার্যত এক ধরনের 'হয়ত-সত্য', 'প্রায়-সত্য' ইত্যাদি রসালো রঙে রাঙায়া হয়ে শতমুখে বিচিত্র ও রোচক চেহারায় পরিণত হয়। এরই ফলে মূল ঘটনাটি প্রায়শই বিকৃত হয়ে পড়ে, এবং সৃষ্টি হয় এক ধরনের সামাজিক বিভ্রান্তি।" অস্বীকার করা যাবে না, গুজবের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে খুব ছোট চেহারার সত্য লুকিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু শতকণ্ঠে প্রচারের ফলে বিষয়টি এত বেশি ফুলেফেঁপে ওঠে যে, তার মধ্যে সত্যটিকে খুঁজে পাওয়া কঠিন—খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো। গুজব সৃষ্টির বিভিন্ন কারণ রয়েছে, সমাজতাত্ত্বিকদের মতে—যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব, দুর্ভিক্ষ বা মড়ক, আত্মপরিচিতির সংকট (Self-identity crisis) ইত্যাদি সামাজিক বিপর্যয়ের সময় বিবিধ গুজব সৃষ্টি হয়। এখানে ব্যক্তিগত একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি; বেশ কিছুদিন আগে কোনো এক বন্ধের দিনে আমরা কয়েক বন্ধু আড্ডা দিচ্ছিলাম। আড্ডার

বিষয় অনেক কিছু, রাজনীতি-অর্থনীতি, দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ইত্যাদি। আস্তে আস্তে টের পেলাম আড্ডার বিষয় পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে,—মোড় নিল আধুনিককালে ধর্মের প্রাসঙ্গিকতা, ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান ইত্যাদি। সবাই অনেক কিছু বলতে লাগলো। কেউ পক্ষে-কেউ বিপক্ষে। এরমধ্যে হঠাৎ করে একজন ক্ষেপে ওঠলো, গলার রং ফুলিয়ে, মুখ লাল করে অতিদ্রুত কি-সব বলতে লাগলো। প্রথমে বুঝতে পারি নাই, দ্বিতীয়বার বলার পর বুঝলাম, মোটামুটি এরকম—"তোরা তো কিছু জানিস না, বেহুদা চিল্লাফাল্লা করে তোদেরও গুনাহ হইতেছে আর আমরাও এর ভাগীদার হইতেছি। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা "নাসা"-র গবেষণাগারে পর্যন্ত আমাদের পবিত্র কিতাবটি (ইচ্ছা করেই পবিত্রকিতাবের নামোল্লেখ করলাম না) রাখা আছে। নাসার বিজ্ঞানীরা আমাদের এই ধর্মগ্রন্থ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই দিনরাত গবেষণা করতেছে। ওঁদের এই মহাকাশ গবেষণা বলিস আর প্রযুক্তিগত উন্নতির কথা বলিস, এগিয়ে যাওয়ার মূল কারণ—আমাদের এই ধর্মগ্রন্থ। আমাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে সব তথ্য নিয়ে ওরা এগুলো করতেছে!" —বন্ধুর আহাম্মকি কথা শুনে প্রথমে হাসবো না কাঁদবো ঠিক বুঝে পেলাম না। ঠিক একই ধরনের বক্তব্য অনেকদিন ধরেই একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিভিন্নজনের (স্বল্পশিক্ষিত থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষিত, মেডিকেল-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া থেকে শুরু করে মাদ্রাসা পড়ুয়া) কাছ থেকে শুনছি। কেউ কেউ আবার এর সাথে বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের একটি অধটুকরো বক্তব্য বড্ড বড়াই করে তুলে ধরে ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞানের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চান! বন্ধুকে আমি এ সুযোগে ক্ষেপানোর জন্য বললাম, জব্বর খবর! এতো কিছু জেনেও তুমি বন্ধু মুখে আঙুল দিয়ে বসে আছো? মিস্টেক, ভেরি মিস্টেক! তা তোমাদের আমেল-কামেলরা কোথায়? এতোদিন ধরে কী করছেন? ইহুদি-নসারা সব অমূল্য জ্ঞান তোমাদের পবিত্র কিতাব থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে, আর তোমরা চেয়ে-চেয়ে দেখছো। শেইম! শেইম! অন্তত আমেল-কামেলদের তো উচিত পবিত্র ঐ কিতাব থেকে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান আগেভাগেই আমাদের বিজ্ঞানী-গবেষকদের জানিয়ে দেয়া। তাহলে আমাদের মত গরিব দেশের আর ইহুদি-খ্রিস্টান পশ্চিমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না? আমার কথার জবাবে বন্ধুটি কিছু বলতে গিয়েও বললো না; মনে হলো রক্তবর্ণ চোখ দুটি দিয়ে ভস্মা করে দিতে চাইছে। অথবা আমার মত পাগলের সাথে কথা বলে বৃথা সময় নষ্ট, ভেবেই চুপ করে গেল। যা হোক, বিষয়টি নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ভেবেছি, এক শ্রেণির মানুষের কাছে কেন "ধর্মগ্রন্থ সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর"-হিসেবে ভূষিত হচ্ছে? আজ "বিজ্ঞানের অপ্রতিরোধ্য যাত্রায় ধর্মবাদীদের মধ্যে আত্মপরিচিতির (সঠিক করে বললে "ধর্মীয় পরিচিতি" হবে) সংকট সৃষ্টি করছে"—বলেই কী এই ধরনের ডাহা গুজব অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে পড়ছে? আমার কাছে মনে হয়েছে,—"যেমন করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপ-আমেরিকার ক্রমবর্ধমান বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ গ্রহণের (পাশাপাশি ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব) প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৯-২০ সালে গঠিত World's Christian Fundamentals Association কিংবা National Federation of Fundamentalists ইত্যাদি নামের সংগঠনের মাধ্যমে খ্রিস্টান মৌলবাদী আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয়, তৎকালীন ভারতেও ভি ডি সাভারকার, বাবুরাও সাভাকার, হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকার প্রমুখের তীব্র হিন্দু মৌলবাদী হিসেবে আবির্ভাব ঘটে, স্বাধীনতার পর নকশালবাদী আন্দোলনের পরমুহূর্তেই সমগ্র ভারতবর্ষে মাতা সন্তোষী-সাঁইবাবা-সাঁইকৃষ্ণের মতো সাজানো দেবতার-ভণ্ডের বাজার সৃষ্টি করা হয়েছিল, ইজরাইল রাষ্ট্র গঠনের প্রতিক্রিয়ায় মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামি মৌলবাদের দ্রুত উন্মেষ ঘটে, আফগানিস্তানে সোভিয়েতবাহিনীর সাথে লড়াই করার জন্য আমেরিকা-পাকিস্তান-সৌদি আরবের প্রচেষ্টায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মুজাহিদ্দীন সংগ্রহ করে ইসলামি মৌলবাদের প্রাতিষ্ঠানিক রূপকে শক্ত ভিত্তির মধ্যে দাঁড় করানো হয়েছিল, তেমনি হয়তো আজ নাইন-ইলেভেনের পরবর্তী ডামাডোলের ফলে আবারো কয়েকটি ধর্মীয় মৌলবাদ ভয়াবহ রকমে বিকাশের পথ পেয়ে গেছে, যার বিচ্ছুরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ধরনের আজগুবি সব গুজবে। সাথে সাথে আধুনিকবিজ্ঞানের নিত্যনূতন আবিষ্কার হয়তো "নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা নিয়ে" ধর্মবাদীদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে।" আমি নিশ্চিত নই, তবে অস্বীকারও করতে পারছি না। মূল আলোচনায় ফিরে যাই, আধুনিককালে

কেউ কেউ 'গুজব'-কে চক্রান্ত তত্ত্ব (Conspiracy theory)-এর আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদের মতে — "চক্রান্ত তত্ত্বের মূল ভিত্তি হলো গুজব। চক্রান্তের সঙ্গে গুজবের একটি সংযোগ স্থাপিত না হলে চক্রান্ত এবং গুজব কোনোটিই সজীব বা সচল হওয়ার প্রাণ বা মাটি পায় না"। আমাদের বাংলাদেশ, পার্শ্ববর্তী ভারত, এবং তৃতীয়বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে রাজনীতি এবং ধর্ম নিয়ে সবচেয়ে বেশি চক্রান্ত করা হয় তাই এগুলিকে নিয়ে বেশি গুজবও তৈরি হয়; এবং এই গুজব প্রচারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে সংবাদপত্রগুলো। ইউরোপ-আমেরিকায় সাধারণ জনগণের মধ্যে ধর্মের রেশ (পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায়) একটু কমে যাওয়ার ফলে সেখানে কৌশলে বিজ্ঞানের নামে উদ্ভূত ধর্মীয়গুজব ছড়ানো হয় অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে; যেমন — জার্মানির নাগরিক এরিক ফন দানিকেনের বিভ্রান্তকর "দেবতারা ভিনগ্রহের মানুষ" প্রকল্প, আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমে প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গমাইল বিস্তৃত বারমুডা দ্বীপপুঞ্জ, পোর্টরিকো ও ফ্লোরিডাকে নিয়ে ত্রিভূজ কল্পনা করে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল নাম দিয়ে চার্লস বার্লিজ কর্তৃক ১৯৭৪ সালে "দি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল" নামের গ্রন্থে আধ-খাওয়া সত্যের মিশেল দ্বারা চাপাবাজিপূর্ণ প্রপাগান্ডা, উইলিয়াম আলবার্ট ডেম্বস্কি, মাইকেল বিহে, ফিলিপ জনসন, জোনাথন ওয়েলস প্রমুখের বিবর্তনবাদ বিরোধী বাইবেলিয় সৃষ্টিতত্ত্বের আলোকে "ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন" থিওরি ইত্যাদি। আলোচনার পরিসর সীমিত রাখার স্বার্থে আমরা এখানে ধর্মকেন্দ্রিক গুজবের কয়েকটি উদাহরণ টানবো :—(১) ১৯৬৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অ্যাপেলো : ৮' উপগ্রহের চন্দ্রাভিযান এবং তার ফলস্বরূপ ১৯৬৯ সালে 'অ্যাপেলো : ১১'-র অভিযান সফল হয়। নীল আর্মস্ট্রং এবং এডুইন অলড্রিনের চন্দ্রে অবতরণ মহাকাশ-গবেষণা নিয়ে মানবসভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়। কিন্তু কতিপয় স্বার্থবাদী-ধর্মবাদী বুজরুক সংস্থা তাদের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকলাপ চালু রাখার জন্য মানুষের চন্দ্রাবতরণ একটি মিথ্যা ঘটনা — এই মর্মে প্রচার চালাতে থাকে। পশ্চিমবিশ্বে খ্রিস্টান মৌলবাদীদের অর্থায়নে পরিচালিত 'আন্তর্জাতিক সমতল পৃথিবী সংগঠন' — এই প্রচার চালাতে থাকে। এই সংগঠনের সচিব স্যামুয়েল শেন্টন এবং চার্লস জনসন প্রচার করতে থাকেন চন্দ্রাবতরণের ঘটনা ঘটেছিল হলিউডের স্টুডিওতে; এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘটনা — যা চলচ্চিত্রের মতোই সাজানো। কয়েকদিন পর আরেকটি ভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন প্রচারণা শুরু করলো — নীল আর্মস্ট্রং চাঁদে গিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি সেখানে আজানের ধ্বনি শুনেছেন (চাঁদে যে বাতাস নেই, এরা মনে হয় জানে না!), তাঁদের ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা মতো চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত দেখে এসেছেন — যার কারণে নীল আর্মস্ট্রং পৃথিবীতে ফিরে এসে ধর্মান্তরিত হয়েছেন! এ দুটি সংগঠনের বিজ্ঞানবিরোধী অপপ্রয়াস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের চাঁদে গমনের ফলে তাঁদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত (দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা লোকঠকানো) সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ঈশ্বর-পয়গম্বরের অলৌকিক ক্ষমতা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে, ফলে ভবিষ্যতে ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের মূল্য দেখিয়ে ব্যবসা করা দুঃসাধ্য হয়ে যাবে। তাই ওরা চক্রান্ত করে নিজস্ব মতটি প্রতিষ্ঠার জন্য মার্কিন মহাকাশ-গবেষণা সংস্থা, — তথা সমগ্র বিজ্ঞান গবেষণাকেই হেয় করতে চাইছে। (২) গত বছর (২০০৬) একুশে আগস্ট ভারতের মুম্বাই শহরের কাছাকাছি মাহিম সমুদ্রতীরের কাছে দরগার এক পিরবাবা প্রচার করলেন — আরব সাগরের জল আল্লাহর দয়ায় মিষ্টি ও পবিত্র হয়ে গেছে। এই গুজব ছড়িয়ে দেয়া মাত্র সারা শহরে খোদা-ভক্তির জোয়ার শুরু হয়ে গেল, মানুষ কথিত পবিত্র জল সংগ্রহের জন্য ভিড় করতে শুরু করলেন এবং জলপানও করতে লাগলেন। মুম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক দূষণ সংক্রান্ত নির্দেশ দেয়া সত্ত্বেও প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন ধর্মের ও বয়সের মানুষ ঐ সমুদ্রজল পান করতে লাগলেন। মূলত ঘটনা হলো দূষণের কারণে ঐ অঞ্চলের সমুদ্রজলে লবনের পরিমাণ অত্যধিক কমে গিয়েছিল। এছাড়া মাহিম সমুদ্রতটটি মিঠি নদীর মোহনায়। এ সময়ে কোনো কারণে মিঠি নদীতে জলস্ফীতি হওয়ায় মিঠি নদীর মিষ্টিজল মাহিম অঞ্চলের সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, ফলে ঐ অঞ্চলের জলে লবনের পরিমাণ আরো উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পায়। কিন্তু গুজবের ফলে ঐ জল পবিত্র আখ্যা পেয়ে পানীয়ের উপযোগী হয়ে গেল! (৩) হিন্দুধর্মের পীঠস্থান হিসেবে স্বীকৃত ভারতবর্ষে বারোমাসই অবতার-মহাপুরুষদের রমরমা অবস্থা। দুয়েকদিন পরপরই ভারতের এখানে-সেখানে

বাবাজী-মাতাজির আবির্ভাব ঘটে এবং মাশাল্লাহ্ ওনাদের নামগুলোও জব্বর : যেমন—আত্মাবাবা, পাইলটবাবা, লালবাবা, বালতিবাবা, ফ্লাইংবাবা, ডাববাবা, আদ্যামা, বড়িমা, ছোটমা ইত্যাদি। এই নানা কিসিমের বাবাজী-মাতাজির মধ্যে এক সময় তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন অন্ধপ্রদেশের সাঁইবাবা; সিন্ধের গেরুয়া আলখাল্লায় ঢাকা, ঝাঁকড়া চুলওয়ালা এই লোক ভক্তদের কাছে সত্য সাঁইবাবা আর যুক্তিবাদীদের কাছে বুজরুক-শিরোমণি। প্রচারের জেটবিমানে চড়ে তিনি এবং তাঁর ভক্তবৃন্দ সারা ভারতেই একসময় প্রচণ্ড ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করতে পেরেছিলেন, আর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন গুজব আর গুজব। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—দেবসম সাঁইবাবা শূণ্য থেকে অলৌকিক উপায়ে ঘড়ি-ছাই বা বিভূতি তৈরি করতে পারেন, সাঁইবাবার ছবি থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি বের হয়, সুগন্ধিযুক্ত বিভূতিও পাওয়া যায় ইত্যাদি। মজার বিষয় হচ্ছে, খুবই সাধারণ কৌশল প্রয়োগ করে এগুলি অহরহ করে চলছেন আমাদের আশেপাশের ম্যাজিসিয়ানরা, কিন্তু তারা কখনোই এগুলিকে অলৌকিক বলে দাবি করেননি। বরং পাবলিককে আনন্দ দেবার সস্তা খোরাক হিসেবে কৌশলগুলো ব্যবহার করেন। এই যে শূণ্য থেকে ঘড়ি সৃষ্টি করা, এখানে মোটেও অলৌকিক কিছু নেই—অনেক আগে থেকেই হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে রাস্তার রাম-শাম-যদু-মধু জাদুকর থেকে শুরু করে বিশ্ববিখ্যাত জাদুকর ডেভিড কপারফিল্ড পর্যন্ত অনেকেই অহরহ এ কাজটি করে আসছেন। শুধু ঘড়ি কেন, মিষ্টি-বল-পাখি-বাক্স-রুমাল ইত্যাদি জিনিষই তারা দর্শকদের সামনে কৌশলে নিয়ে আসেন। এ প্রক্রিয়াটিকে ম্যাজিকের ভাষায় বলে 'পামিং'। পামিং হল কিছু কৌশল, যার মাধ্যমে ছোটখাট কোনো জিনিষকে হাতের মধ্যে অথবা পোষাকের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রাখা হয়। তারপর একথা-সেকথা বলতে বলতে দর্শকের মনযোগ অন্যদিকে সরিয়ে চটজলদি জিনিষটাকে বের করে নিয়ে আসা হয়। আর প্রচুর ছাই বের করতে চাইলে হাতের মধ্যে তো আর লুকিয়ে রাখা যাবে না, তখন ছাই ভর্তি ব্লাডার যুক্ত একটি সরু নল বগলের নীচ থেকে হাতের কজি পর্যন্ত বাধা থাকে। পোষাকের নীচে ঢাকা পড়ে যায় এই ব্লাডার ও নল। এরপর সময়-সুযোগ মতো ছাই সৃষ্টি করতে চাইলে শুধু ব্লাডারে একটু চাপ দিলেই হবে। ব্লাডার থেকে ছাই নল বেয়ে একদম হাতে চলে আসবে। কলকাতার বিখ্যাত জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) একবার এরকম পামিং করে দেখিয়েছিলেন স্বয়ং সাঁইবাবাকে। ১৬-০৪-৭৮ তারিখের ইংরেজি সাপ্তাহিক *সানডে* থেকে জানা যায়, তিনি একবার পরিচয় বদল করে সাঁইবাবার সাথে একবার দেখা করতে যান এবং সাঁইবাবাও তখন চিনতে না পেরে, অন্যান্য নির্বোধ ভক্তের মতো একজন ভেবে ভেলকিবাজি দেখাতে লাগলেন। এক ফাঁকে পি. সি. সরকার সাঁইবাবার মতই শূণ্য হাত নেড়ে একটি রসগোল্লা নিয়ে আসেন এবং সাঁইবাবার হাতে দেন। হঠাৎ এভাবে অপরিচিতের সামনে নিজের ভণ্ডামো উলঙ্গ হয়ে যাওয়ায় সাঁইবাবা আতঙ্কে চিৎকার করে স্থান ত্যাগ করেন। সাঁইবাবার ছবি থেকে যে জ্যোতি নির্গত হচ্ছে বলে গুজব বেরিয়েছে, তা আর কিছু না—ওটি ছিল *infra-red photography*। এই পদ্ধতিতে ছবি তুললে যে কোনো জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের শরীর থেকে জ্যোতি নির্গত হচ্ছে বলে মনে হয়। এখানে আলাদাভাবে সাঁইবাবা বা গাধার কোনো তফাৎ নেই। ছবি থেকে সুগন্ধিযুক্ত বিভূতি পড়তে পারে দুভাবে :— (এক) আগে থেকেই কোনো ভক্ত অন্য ভক্তদের চোখে নিজেকে বড় করে তোলার জন্য সুগন্ধি মিশিয়ে বিভূতি সাঁইবাবার ছবির নীচে ছড়িয়ে দিতো অথবা (দুই) সাঁইবাবার ছবির কাঁচে ল্যাকটিক এসিড ক্রিস্টাল মাখিয়ে ঘষে দেয়া হতো। ল্যাকটিক এসিড ক্রিস্টাল বাতাসের সংস্পর্শে এলে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে বিভূতি বা ছাইয়ের মতো ঝরে পড়ে; কার ছবি সেটা বিষয় না। বোঝাই যাচ্ছে "সাঁইবাবা" প্রজেক্টে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ভেলকি দেখিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপরতলার লোকেরা সাঁইবাবার শিষ্য সংখ্যা বাড়াতে চেয়েছিল আর জনসাধারণের মধ্যে একটি উদ্ভট ধর্মীয় উন্মাদনা জিইয়ে রাখার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। (৪) ১৯৯৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় খবরটা বের হয়— "২১ সেপ্টেম্বর দিল্লির এক মন্দিরে দেবতা গণেশ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা নাকি ভক্তের হাত থেকে চামচে করে দুধ পান করেছেন"। খবরটা ছড়াতে যতটা না সময় লাগে, তার থেকে হাজার গুণ বেশি দ্রুত হুজুগে মেতে ওঠে ভারতের হিন্দু জনগণ। কাতারে কাতারে মানুষ দেবতাকে দুধ খাওয়াতে মেতে ওঠে যুক্তিতর্কের তোয়াক্কা না করে,— এক হিসেবে দেখা

যায় শুধু দিল্লিতেই ঐ সময় ২৫ হাজার লিটার দুধ উবে গেছে দেবতার নামে! এরপর এই গুজবের রেশ দিল্লি ছাড়িয়ে মুম্বাই, কলকাতা পাড়ি দিয়ে নেপাল, সিকিম, বাংলাদেশে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যা বাড়িতে যে ঠাকুর আছেন, তাঁরা সন্ধলেই চোঁ চোঁ করে দুধ পান করতে লাগলেন। ফলে দেখা গেল—দুদিনের মাথায় দুধের দাম হু হু করে বেড়ে সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেল। আর মন্দিরের বাইরের নর্দমা দিয়ে ভেসে যেতে লাগলো লিটার লিটার দুধ। হুজুগের স্রোতে ভেসে না গিয়ে রুখে দাঁড়ালেন এ অঞ্চলের যুক্তিবাদিরা। তাঁরা মানুষকে বোঝাতে লাগলেন : "তরলের একটা ধর্মই হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া। পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে সারফেস টেনশন। উদাহরণ হিসেবে হাতেনাতে দেখালেন,—কেরোসিনের তেলটা সলতের নীচে থাকে। অথচ আলোটা তো তেল পুড়েই তৈরি হচ্ছে, সলতেটা তো এজন্য দাউদাউ করে জ্বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে না। কারণ—কেরোসিনের তেল একটু একটু উপরে উঠে আসছে সলতে বেয়ে, আর এজন্যই দীর্ঘসময় ধরে আগুন জ্বলতে পারে। কিন্তু এখন যদি সলতেটা না জ্বালিয়ে, অনেকটা বাড়িয়ে নীচের দিকে নামিয়ে সলতেটা নীচু অন্য একটি কেরোসিনের পাত্রে রেখে দিলে কী হবে? তখন কেরোসিন তেলটা সলতে বেয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে নীচের অন্য কেরোসিন পাত্রে গিয়ে জমা হবে। ঠিক ঐ ব্যাপারটি ঘটেছে গণেশকে দুধ খাওয়ানোর সময়। গণেশের ঝুঁড়ের গোড়ায় দুধ ভর্তি চামচ অল্প হেলিয়ে ধরায় দুধের ক্ষীণ ধারা সামান্য একটু উঠে ভুঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে।" কিন্তু এই ভুঁড়ি বেয়ে দুধ নেমে যাওয়া চট করে নজরে আসে না, কারণ—মন্দিরের দেবতার গলায় ফুলের মালা, নানা রঙের পোষাক পড়ানো থাকে। যারা বাসা-বাড়িতে দেবতার মূর্তিকে দুধ পান করিয়েছেন, তারা যদি একটু কষ্ট করে মূর্তির পোষাকে অথবা শরীরে হাত দিতেন তবে টের পেতেন নেমে যাওয়া দুধের অস্তিত্ব। কিন্তু আফসোস! হুজুগ মানুষকে এতোই কাণ্ডজ্ঞান শূণ্য করে ফেলে তা অচিন্তনীয়। পাঠকের হয়তো মনে আছে গতবছরও একই হুজুগে মেতে ছিল ভারত-বাংলাদেশ-নেপাল-কানাডা-আমেরিকার হিন্দুরা। দশ বছর আগেকার ঘটনার সময় দেয়া বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার ধার এবারো ধারে নাই হুজুগে মানুষগুলো। তারা চায় নিত্যানতুন গুজব। যাহোক, এখন উপযুক্ত উদাহরণগুলোকে নেড়ে-চেড়ে দেখলে বুঝা যায়:— (এক) প্রত্যেকটি গুজব সৃষ্টির পেছনে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে, অথবা বলা যেতে পারে কোনো এক বা একাধিক উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখেই গুজবগুলি ছড়ানো হয়। যেমন : প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে গুজব ছড়ানোর পিছনে দূষিতকারীদের প্রধান উদ্দেশ্য অবাধ লুণ্ঠরাজ করা। অপরদিকে ঈশ্বর বা ধর্ম নিয়ে গুজব সৃষ্টির পিছনে রয়েছে ধর্মগুরুর ক্ষমতা-প্রণামী বৃদ্ধি, ভোটের সময় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে একটা ফ্যাক্টর হয়ে দেখা দেওয়া, শ্রেণিবৈষম্য টিকিয়ে রেখে এ যুগের "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়"-দের শাসন-শোষণ দীর্ঘস্থায়ী করা। (দুই) প্রকৃতির খেলালে যে অস্বাভাবিকত্ব দেখা যায়, তাকে অবলম্বন করে কিছু লোকের মধ্যে ব্যবসা ফেঁদে ধনসম্পত্তি বৃদ্ধির লিপ্সা কাজ করে। তাই প্রত্যেকটি গুজব তৈরির পিছনে অসংখ্য বুদ্ধিবাজদের চিন্তার উদ্ভাবনী শক্তিকে স্বীকার করতেই হয়; দেখা যায় এমনভাবে গুজব ছড়ানো হয় যা সচরাচর মানুষের সাধারণ ভাবনায় আসে না। (তিন) আপাত অস্বাভাবিক গুজবের পেছনে নিশ্চিত কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আপাত অপার্থিব-অলৌকিক ঘটনার পেছনে যুক্তিগ্রাহ্য-বিজ্ঞানসম্মত কারণ থাকে, যা পরে অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি, হুজুগ দানা বাঁধতে সক্ষম হয় মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের উপর ভর করে। যেদিন থেকে বিজ্ঞানমনস্কতা আর যুক্তিবাদের আলোয় মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস কেটে যাবে সেদিন থেকে কোনো গণেশঠাকুর দুধ পান করবেন না, কেউ আর অলৌকিকতায় ভর করে উর্ধ্বলোকে গমন করতে পারবে না, আঙুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে না, ঈশ্বর-ভূত-প্রেত কোনো ব্যক্তির ওপর ভর করবে না, কোনো অবতারও এ দুনিয়ায় জন্ম নিবে না কিংবা কোনো ধর্মগুরু আর অলৌকিকতাকে নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে না। তখন পার্থিব এ জগতে কোনো অপার্থিবতার স্থান থাকবে না, পৃথিবী হবে শুধুই প্রকৃতির আর মানুষের।—বাংলাভাষায় গুজব বা হুজুগ সম্পর্কে একেবারে নৃতাত্ত্বিক আলোচনা জানতে হলে, আগ্রহীরা পড়তে পারেন: পশ্চিমবঙ্গ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা *লোকসংস্কৃতি গবেষণা*, "গুজব-হুজুগ ও লোকসংস্কৃতি"-বিশেষ সংখ্যা, ১৯বর্ষ ৪ সংখ্যা, ১৪১৩।

(১৩) প্রবীর ঘোষ এবং পিনাকী ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (তৃতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৯৪-৩০২।

(১৪) প্রবীর ঘোষ, *অলৌকিক নয় লৌকিক* (প্রথম খণ্ড), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৭৪।

(১৫) টীকা : আমরা দেখেছি এ পৃথিবীতে সব সময়ই কিছু "ঘাড় বাঁকা" লোকের আবির্ভাব ঘটে যারা যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলে; এর জন্য জেলজুলুম-নির্যাতন-ভয়ভীতি কোনো কিছুই পেরোয়া করে না। এ জ্ঞানচিন্তক-সত্যানুসন্ধানী-মুক্তচিন্তকের উদাহরণ আমাদের চারপাশে কম নয়; সত্বেটিস, গৌতম বুদ্ধ, হাইপেশিয়া, ইবনে সিনা, ওমর খৈয়াম, ব্রুনো, গ্যালিলিও, ডারউইন, মার্ক্স, লেনিন, আরজ আলী, আহমদ শরীফ প্রমুখ। এঁদের কেউবা শোষিত মানুষের পক্ষে, সাম্যের সমাজ গঠনের জন্য নিজেকে আত্মনিবেদন করেছেন, কেউবা মানুষের প্রশ্ন করা-জিজ্ঞাসা-মুক্তচিন্তার অধিকার রক্ষায় নিজেকে আত্মোৎসর্গ করেছেন, কেউবা নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েও কাল্পনিক পৌরাণিক বাণীর কাছে বিজ্ঞানকে মাথা নত করতে দেননি। তাঁরা আমাদের নমস্য। কিন্তু এ সমাজ-সভ্যতায় এখনো ভণ্ড-বুজবুজ-মানসিক ভারসাম্যহীনদের জাহিলিয়া শেষ হয়নি, চলছে স্টিম রোলার কখনো প্রকাশ্যে, কখনো কৌশলে। তাই শাসকশ্রেণী আর তার পেটোয়া বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট অপার্থিবতা-অলৌকিকতার আফিমে আসক্ত জনগণের মোহমুক্তির জন্য এখনো কিছু সত্যসন্ধানী-যুক্তিবাদী স্রোতের বিপরীতে অবস্থান করছেন। এঁদেরই একজন আমাদের দেশের অতিপরিচিত জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ। বিজ্ঞানমনস্ক এই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই অলৌকিকতার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার প্রয়াসে নিবেদিত। তিনি প্রকাশ্যে (১৯৮৪-৮৫ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত দুটি সাক্ষাৎকার) চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, তিনি বেঁচে থাকা পর্যন্ত পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের যে কোনো ব্যক্তি যদি ভূত অথবা অন্য কোনো অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে, তবে তাকে দেয়া হবে এক লক্ষ বাংলাদেশি টাকা পুরস্কার। সস্তা জনপ্রিয়তার মোহে নয়, কিংবা জনগণের আবেগকে সুড়সুড়ি দেবার উদ্দেশ্যেও নয়, বরং এ চ্যালেঞ্জ প্রদানের একটাই উদ্দেশ্য, ভদ্রতা-অতিলৌকিকতার মুখোশ পড়ে যারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে, তাদেরকে বেআব্রু করে সহজ সত্য জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। শুধু আমাদের জুয়েল আইচ নন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি নিজস্ব উদ্যোগে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, অজ্ঞানতা দূর করে যুক্তিবাদী-বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ার কাজে নিয়োজিত। এ জন্য প্রয়োজন হলে চ্যালেঞ্জ জানানোর পাশাপাশি প্রকাশ্যে তথাকথিত অলৌকিক দাবিদারদের কাজকারবার, লৌকিক কৌশল প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন যাতে জনগণের ভুল ভাঙে, অন্ধবিশ্বাসকে নিজের মনন থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে পারে। আমার জানা মতে, সবচেয়ে প্রাচীন (১৮৮০ সালে ইংল্যান্ডে স্থাপিত) প্রতিষ্ঠান Society for Psychical Research এ পর্যন্ত বহু অলৌকিক ক্ষমতার নামে প্রতারণাকে উদ্ঘাটিত করেছে। প্রতারণাদেরকে করেছে নগ্ন। বর্তমান বিশ্বে পরিচিত গণিতবিদ ও ম্যাজিসিয়ান জেমস র্যান্ডি এবং তাঁর Committee for investigation of claims of the paranormal (CSICOP) নামক প্রতিষ্ঠানটি এক মিলিয়ন ডলার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি অলৌকিকতাকে লৌকিক কৌশল ব্যতিরেকে দেখাতে পারে তবেই তাকে এ পুরস্কার দেয়া হবে। সারা বিশ্বে প্রায় পঞ্চাশটির অধিক শাখা-সংগঠন খুলে তথাকথিত অতিলৌকিক কর্মকাণ্ড, অবতারদের রহস্য অনুসন্ধান, প্রকাশ, অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ে চলছে অবিরাম। এখানে আরেকজন যুক্তিবাদী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতেই হয়, যিনি আজীবন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে লড়াই করে গেছেন। শ্রীলংকার ড. আব্রাহাম টি. কোভুর (১৮৯৮-১৯৭৮)। ড. কোভুর মানুষের চেতনা মুক্তির জন্য, অন্ধবিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যকে গ্রহণ করতে পারবে—এই বোধ থেকে দীর্ঘদিনের অধ্যাবসায়ের দ্বারা দুটি বই "Begone Godmen" এবং "Gods, Demon & Spirits" রচনা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে রচিত এই দুই বইয়ে বহু আপাত অলৌকিক ঘটনা, অপ্রাকৃতিক-অতীন্দ্রিয়বাদের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, সাথে সাথে জনগণের স্বার্থবিরোধী ও শাসকশ্রেণির স্বার্থপুষ্টিকারী বাবাজী-মাতাজীদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। ১৯৬৩ সালে সমস্ত পৃথিবীর সামনে ড. কোভুর অলৌকিকতা-অপার্থিবতার বিরুদ্ধে এক লক্ষ শ্রীলংকান রূপির চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেন। ড. কোভুর বলতেন, অবতার, সাধু, যোগী, সিদ্ধ পুরুষ, গুরু স্বামীজি ও অন্যান্য যারা দাবি করেন, আধ্যাত্মিক তপস্যা বা ঈশ্বরের আশীর্বাদে তারা অলৌকিক ক্ষমতা রপ্ত করেছেন তারা যদি যে কোনো একটি অলৌকিক কাজ কোনো কৌশল ব্যতিরেকে দেখাতে পারেন, তবে এ পুরস্কার জিততে পারবেন। অলৌকিক কাজগুলো হচ্ছে— খামে পোরা টাকার নাম্বার বলে দেয়া, টাকার নোটের ছবুছ আরেকটি তৈরি করা, যে জিনিষটি চাওয়া হবে তা শূণ্য থেকে নিয়ে আসা, মানসিক শক্তি বলে একটি কঠিন বস্তুকে বাঁকানো, টেলিপ্যাথির সাহায্যে আরেক জনের মনের খবর জেনে নেয়া, যোগবলে শূণ্যে ভেসে থাকা, এক স্থানে শরীর ত্যাগ করে অন্য স্থানে আবির্ভূত হওয়া, ছবি তোলা যায় এমন একটি ভূত বা আত্মা নিয়ে আসা ইত্যাদি। এখানে লক্ষণীয় যে, কোভুর তাঁর চ্যালেঞ্জে এমন সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যা অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারেরা সচরাচর ঘোষণা করে থাকেন। এঁর মধ্যে কেউ কেউ কোভুরের চ্যালেঞ্জ সাহস করে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শেষমেশ সবাই কোভুরের হাতে ধরা পড়ে মান-সম্মানসহ জামানতের টাকা পর্যন্তও খোয়েছেন। এবার আমরা যার কথা বলব, আমার মনে হয়, তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের পাঠকদের সাথে নূতন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার নেই। তিনি এ উপমহাদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ প্রবীর ঘোষ; অনেকের কাছে ভূতের পুলিশ। তাঁর ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি সম্পর্কে আমরা সবাই কম-বেশি জানি। প্রবীর ঘোষের লেখা অলৌকিক নয় লৌকিক, সংস্কৃতি : সংঘর্ষ ও নির্মাণ, আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, প্রসঙ্গ সন্তোষ এবং ... প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলাদেশের বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজসচেতন পাঠকের কাছে তুলুল জনপ্রিয়। অনেকেরই জানা আছে, প্রবীর ঘোষ তাঁর সমিতির মাধ্যমে জ্যোতিষ, ফেং শুই, রেইকি গ্রান্ডমাস্টার, অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি বিশ লক্ষ ভারতীয় রূপির চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছেন। এই চ্যালেঞ্জ বলবৎ থাকবে প্রবীর ঘোষ জীবিত থাকা পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবান খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত। দুঃখের বিষয়, একজন অলৌকিক ক্ষমতার দাবিদারও নিজের অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিতে পারেননি এখনো। জানা গেছে আজ পর্যন্ত প্রবীর ঘোষ এবং যুক্তিবাদী সমিতির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে পরাজিত হয়েছেন হাজারখানেক "অলৌকিক" বাবাজী-মাতাজী, বিধ্বস্ত-পলাতক জ্যোতিষীর সংখ্যা পৌনে দু'শ অতিক্রান্ত আর তাঁরা ভূতুরে বাড়ি বা ভূতের ভর ধরেছেন শ'খানেক। প্রবীর ঘোষ বলেন, "অনেকের কাছে চ্যালেঞ্জ শব্দটি অশোভন মনে হতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য পর্যায় হল— চ্যালেঞ্জ। প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে যে গল্পের গুরুগুলো গাছে চড়ে বসেছে, তাদের মাটিতে নামিয়ে এনে আবার ঘাস খাওয়ানোর জন্যই এই চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ বাস্তব সত্যকে বড় বেশি স্পষ্ট করে তোলে। সাধারণ মানুষের কাছে আজকের জনপ্রিয় প্রশ্ন এটাই— চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেই দাবি প্রমাণ করা যায়, বাস্তবসত্যকে জানা যায়, সেখানে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে দ্বিধা থাকবে কেন?" তিনি আরো বলেন, — "আমি চাই, আমার এই চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে আরো কিছু মানুষ বুঝতে শিখুন, বিশ্বাস করতে শিখুন, অলৌকিক ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব এ বিশ্বে নেই। অলৌকিকতা যা আছে, তা শুধুই পত্র-পত্রিকা, ধর্মগ্রন্থ ও বইয়ের পাতায়।" প্রবীর ঘোষের যুক্তিবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ, নেপালসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানমনস্ক-সমাজ সচেতন মানুষেরা তাঁদের নিজ নিজ সাধ্যের মধ্যে যুক্তিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন অপার্থিব ক্ষমতার দাবিদারদের প্রতি, হাতেনাতে তাদের ভণ্ডামো উন্মোচন করে চলছেন, জনসাধারণদের শিখিয়ে দিচ্ছেন বুজরুক অপার্থিব ক্ষমতাবানদের লৌকিক কৌশলগুলো। বাংলাদেশে এখনো যে সকল বুজরুক অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি— এতোই যখন আত্মবিশ্বাস নিজের ক্ষমতার প্রতি, তাহলে একটু কষ্ট করে প্রবীর ঘোষ প্রদত্ত চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করুন। চ্যালেঞ্জে জিততে পারলে, পাবেন আন্তর্জাতিক বিশাল খ্যাতিসহ বিশলক্ষ ভারতীয় রূপি, সাথে এ

উপমহাদেশের অসংখ্য যুক্তিবাদী মানুষ, যারা আপনার খাসবান্দা হিসেবে আজীবন সেবা করে যাবে নির্দিধায়। প্রবীর ঘোষের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:— প্রবীর ঘোষ, ৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭০০০৭৪। আর পাঠক, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, বুঝেন—যুক্তিবাদী-বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে এ সমাজ-পরিবেশ অনুকূলে নয়; প্রতি পদে-পদে প্রথা-নীতি-নৈতিকতার নামে ভণ্ডামোর শিকল লাগানো। মৌলবাদী-ধর্মাবলম্বী-দালাল আর শাসকশ্রেণির "সুপারগু" লাগানো সম্পর্কের ফলে কখনোই কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠন সম্ভব হবে না, যতক্ষণ না আপামর জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠবে। তাই সমাজসচেতন পাঠক, আপনার সহযোগিতার বড্ড প্রয়োজন, আগামীদিনের শ্রেণিহীন-শোষণহীন-ভণ্ডামোমুক্ত-প্রতারকমুক্ত সাম্যের সমাজ গঠনের জন্য। আমরা আপনার অপেক্ষায় আছি। আপনার হাতটি বাড়িয়ে দিন।

-০-

■ অনন্ত বিজয় দাশ : শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।